বাজেট ও সমাজ-বাস্তবতা*

- মো: আনিসুর রহমান

১. ভূমিকা

[এই প্রবন্ধটিতে অন্তর্ভুক্ত কিছু কথা প্রশ্নোত্তরভাবে ২০শে জুন দৈনিক প্রথম আলোর সঙ্গে একটি সাক্ষাতকারে প্রকাশিত হয়েছে। তারপরে আমি কয়েকটি টেলিফোন কল্ পেয়েছি এই বলে যে "আপনি খুব ভালো বলেছেন"। এধরনের শুধু টেলিফোন কলের কোন সার্থকতা নেই - যদি কেউ মনে করেন এই কথাগুলির কোন মূল্য আছে তাহলে তাঁদেরও কথাগুলি প্রকাশ্যে বলা দরকার লেখা দরকার যাতে এরকম কথার স্বপক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। আমার একার কথার কোন মূল্য নেই, গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী থাকা উচিতও নয়। এসম্বন্ধে আমি উপসংহারে আরো কিছু বলেছি।]

প্রতি বছরের মতো এবারও বাজেট এল দেশবাসীকে আনন্দ করবার আহ্বান জানিয়ে। কিন্তু আনন্দ করতে পারছি না।

একথা বিশেষ করে এবছরের বাজেটের বিরুদ্ধে নয়। প্রতি বছরই মূলত: একই রকম বাজেট আসছে, সরকার নির্বিশেষে, অর্থমন্ত্রী নির্বিশেষে। তাই আমার বর্তমান সমালোচনা বিশেষ করে বর্তমান সরকারকে উদ্দেশ করে নয়, যিনি সরকারের বাজেট পেশ করছেন তাঁকে উদ্দেশ করেও নয় - এই সমালোচনা সামগ্রিকভাবে দেশের অগ্রণী রাজনৈতিক ধারাগুলির বিরুদ্ধে যে ধারাগুলির যে কোনটি ক্ষমতায় আসলে উন্নয়নের নামে দেশকে ক্রমাগত নীচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যে অধ:গতি প্রতিবছর বাজেটের আত্মপ্রশস্তিময় ভাষা দিয়ে ঢেকে রাখবার প্রয়াস হয়ে আসছে।

২. উন্নয়ন, না জিডিপি বৃদ্ধি?

বজেটে সরকারের অর্থনীতি পরিচালনার আত্মমূল্যায়ন করা হয়, এবং এই মূল্যায়নে এদেশের সরকাররা দেশের জিডিপি-বৃদ্ধির হারকে উন্নয়নের প্রধান সূচক বলে বরাবরই ধরে আসছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে উন্নয়নের অনেক ডাইমেনশন আছে যে সব ডাইমেনশনের অনেকগুলিই জিডিপি-র মধ্যে সরাসরি ধরা পড়ে না। তবে এই সূচক অনুযায়ী প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশী হলে - যথা, বাৎসরীক কমবেশি দশ পার্সেন্টের মতো - মোটামুটি ধরে নেয়া যেতে পারে যে দেশের অর্থনীতিতে এমন একটা গতিশীলতা এসেছে যা সমাজের অন্যান্য ধারাসমূহের ওপর সামগ্রিকভাবে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এমন কি দেশের নেতিবাচক ধারাগুলিরও মোড় ঘোরাতে অবদান রাখতে পারে, এবং এই জন্য এরকম জিডিপি বৃদ্ধির হার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের হারের একটা মাপকাঠি বলে ধরে

নেয়া যেতে পারে। কিন্তু জিডিপি বৃদ্ধির হার মামুলি হলে এটা আর ধরে নেয়া যায় না; তখন অর্থনীতির গতিশীলতা দুর্বল থাকে বলে সমাজের অন্যান্য অনেক ধারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পথে চল্‌তে পারে, এবং নেতিবাচক ধারাগুলি প্রাধান্য পেতে পারে যার ফলে দেশ সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের পথে না যেয়ে অবনয়নের পথেই ধাবিত হতে পারে জিডিপির কিছু বৃদ্ধি হতে থাকলেও।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে জিডিপি বৃদ্ধির হার মামুলিই রয়ে গেছে এটাই আজ পর্যন্ত এদেশের সব সরকারেরই দারুণ কৃতিত্ব, এবং এই জন্য এই সূচকটি এদেশের বিকাশ কোন্ দিকে বেশী বা কম এবং সামগ্রিকভাবে এদেশের উন্নয়ন হচ্ছ না অবনতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে তেমন কিছু বলতেই পারে না। উদাহরণস্বরূপ একথা বোধ হয় সাজেস্ট করা যায় যে এদেশে আজকে সবচেয়ে বড়ো "শিল্প" - কর্মসংস্থান, দ্রব্যাদি উৎপাদন, "ব্যাকওয়ার্ড-ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ" এবং আমদানী-রপ্তানীর দিক দিয়ে - হল "সন্ত্রাস-শিল্প"। "মাদক-শিল্প" হয়তো তার পরে। এত বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলি কিন্তু জিডিপির হিসাব থেকে বাদ পড়ে আছে, যে খাতগুলির ওপর দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা, এবং বাকি সমস্ত মানুষের চলাফেরা বাঁচবার নিরাপত্তা ও সম্ভ্রমরক্ষার সম্ভাবনা নির্ভর করছে। এই খাতগুলোকেও প্রবৃদ্ধির হিসাবের মধ্যে ধরলে, এবং যথাযথ (মাইনাস) চিহ্ন দিয়ে ধরলে, জিডিপি বৃদ্ধির হিসাব কোথায় দাঁড়াবে আমি জানি না কারণ পরিসংখ্যান ব্যুরো এই পরিসংখ্যানগুলি সংগ্রহ করে না যদিও দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে এই খাতগুলির কর্মকান্ড প্রতিদিন চরম আতঙ্ক বা দুর্যোগ এনে দিচ্ছে। তবে এদেশে উন্নয়নের মূল্যায়নে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডগুলি হিসাবের মধ্যে না ধরলে এদেশের 'উন্নয়ন' সম্বন্ধে সরকার তথা বাজেটের মূল্যায়ন এবং দেশের সাধারণ মানুষের মূল্যায়নের মধ্যে যে এক সাগর ব্যবধান থেকে যাবে একথা নিঃসন্দেহে দাবী করা যায়।

আসলে অর্থশাস্ত্রে অনেক আগেই, বিশেষ করে "অনুন্নত" বা "উন্নয়নশীল" বা যে নামে ইচ্ছা ডাকুন দেশগুলির উন্নয়ন-প্রশ্ন আলোচনায় উন্নয়নের সুচক হিসাবে জিডিপি তথা যে-কোন একক সূচকের অযোগ্যতা স্বীকৃত হয়েছে। দেশে উন্নয়ন হতে থাকলে মানুষের "জীবনযাত্রার মান" তো বাড়তে থাকবে। এদেশে কিন্তু আমরা দৈনিক জীবনযাত্রায় ক্রমবর্দ্ধমান নিরাপত্তাহীনতার সম্মূখীন হচ্ছি - সরকারের মন্ত্রীরা যারা সরকারি গাড়ী ও সিকিউরিটি পুলিশ নিয়ে ঘোরেন এবং প্রয়োজন হলে অনুগত মস্তানদেরও তলব করতে পারেন তাঁরা বুঝতেই পারবেন না আমি নিজে এবং আমার পরিবারের সদস্যরা রাস্তায় হেঁটে বা রিক্সায় বা সি,এন,জিতে করে যেতে কিরকম আতংকে থাকি - আমার একাধিক প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয়দের ওপর হামলা হয়ে গেছে, আমার বা আমার পরিবারের সাক্ষাত সদস্যদের ওপরও যে কোন দিন হতে পারে। হলে পুলিশের কাছ থেকে কিরকম সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তাতো আমরা ভালো করেই জানি। আমার মতো "বিশিষ্ট ব্যক্তি"-রই এই অবস্থা। প্রতিদিন

দেশের নানান জায়গা থেকে সন্ত্রাসী-মস্তানী-চাঁদাবাজি-ডাকাতি, পূরো-শহর-সন্ত্রাসীদের-কাছে-জিম্মি, গ্রামাঞ্চলে একই রকম সন্ত্রাস ছাড়া ক্ষমতাসীনদের দ্বারা ক্ষমতাহীনদের সন্ত্রাসী-মস্তানদের সাহায্যে জমি-জমা ঘর-বাড়ী থেকে উচ্ছেদ, মস্তান-চাঁদাবাজিদের দ্বারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহে যানবাহন অকেজো করে দেয়া, এধরণের নানাবিধ খবর সংবাদপত্রে রোজই বেরোচ্ছে। সন্ত্রাসের বিস্তারিত বিবরণ পড়লে গা হিম হয়ে আসে, মনে হয় জাতির একটা বড়ো অংশের অবচেতন মনে ভয়ানক হিংস্র একটি স্পৃহা জেগে উঠছে যা মনোবিজ্ঞানী কার্ল য়ুঙ্ তাঁর গবেষনায় বিশ দশকের নাৎসী জার্মানীর "কালেক্টিভ্ আন্কন্শাস"-এ যেরকম দেখেছিলেন তার সঙ্গে তুলনীয়। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার চেষ্টায় - সিকিইরিটি গার্ড রাখা, বাসার চারদিকে গ্রীল দেওয়া, পাড়ার মস্তানকে নিরাপত্তার জন্য টাকা দেওয়া কিংবা প্রতিবেশিরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে যৌথভাবে কোন ব্যবস্থা করা - পরিবারের বাজেটে ঘাট্তি বেড়েই চলেছে। নিরাপত্তাহীনতা এবং (শহরে) যানযট ইত্যাদি কারণে মানুষে মানুষে সামাজিক মেলামেশা অনেক কমে গেছে এবং আরো যাচ্ছে। আমার বাসাতেই একটি গ্রুপ আসতো সঙ্গীত চর্চা করতে, সেটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল মেয়েরা রাতে রিক্সা করে যাওয়া-আসা করতে উত্তরোত্তর ভয় পেয়ে আসা বন্ধ করতে থাকল বলে, অর্থাৎ "উন্নয়ন"-এর দৌলতে এধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও মিলিয়ে যাচ্ছে। ছেলে-মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়াতে আজকে লাখ-লাখ টাকা ডিপোজিট দিতে হয়। সার্বিকভাবে দেশে শিক্ষার মান নেমে এমন জায়গায় এসেছে-যে আজকে সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারীর দায়িত্বে আসীন একাধিক ব্যক্তি বাংলা বা ইংরেজী কোনটাই শুদ্ধ করে লিখতে পারেন না এ আমি নিজে দেখেছি, অর্থাৎ এত খরচ করেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ছাত্ররা নিম্নতম মানের শিক্ষা পাচ্ছে না। এর ওপরে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস তো রয়েছেই। চিকিৎসার কথায় আসলে বাস্তবতা আরো অভাবনীয় - দেশের রাজধানীর "হাসপাতাল ক্যাম্পাসে অসামাজিক কার্যকলাপ, নেশা জাতীয় দ্রব্যের কেনাবেচা ও সেবন, শিশু চুরি ও পাচার, রোগীদের টাকা পয়সা ও ওষুধ লুটপাট এবং মহিলাদের উত্যক্ত করা এখন নৈমিত্তিক ঘটনা" (প্রথম আলো, ২২ জুন ১৯৯৯)। অন্যদিকে আমাদের সন্তানরা বিশ্বকাপ জেতবার সাধনা করবার জন্য খেলার মাঠ আর পাচ্ছে না রাস্তায় অথবা ফ্ল্যাটবাড়ীর বারান্দায় খেলবার করুণ প্রচেষ্টা করছে, আর খেলার মাঠগুলি ভরে যাচ্ছে হাই রাইজ এজেন্সীদের লাভের অঙ্ক বাড়াবার জন্য। একই উদ্দেশ্যে নদী-পুকুর-লেকও বেআইনীভাবে ভরাট হয়ে আমাদের সন্তানদের সাঁতার শেখরার ও সাঁতার কাটবার জায়গা, এবং আমাদের সকলেরই জীবনের স্নিগ্ধতা নি:শেষ করে দিচ্ছে যে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নিজের সাম্প্রতিক সরল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সরকার অসহায় বোধ করছে! ঢাকা শহরের বায়ুদুষণে আমাদের সন্তানদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনি নানাভাবে জনগনের জীবনযাত্রার মান আগের তুলনায় নেমেই চলেছে, এবং কোনমতে তাকে ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় পারিবারিক খরচ ওপরের দিকে দৌড়াচ্ছে। অথচ বাজেটে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী "মুদ্রাস্ফীতির" হার অল্পই বাড়ছে, যেন নিরাপত্তা একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় "দ্রব্য" নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এরকম "দ্রব্য"

নয়, সন্তানের খেলার ও সাঁতার কাটবার জায়গা লেকের পানির স্নিগ্ধতা ও বাতাসে অক্সিজেন এরকম"দ্রব্য" নয়, যে "দ্রব্য" গুলির মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অথবা একেবারে দুস্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ার বাস্তবতা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সূচকের অন্তর্ভূক্তি করা প্রয়োজন নয়! অচিরেই ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় হয়তো শ্বাস নেবার জন্য পেট্রোল পাম্পের মতো "অক্সিজেন পাম্প"-এর স্টেশন বসবে (যেমনটা নাকি মেক্সিকোতে হয়েছে বলে শুনেছি), এবং তখন এই নতুন উৎপাদন ও বছরে বছরে তার বৃদ্ধির দৌলতে অর্থাৎ এভাবে অক্সিজেন পেয়ে জিডিপি অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির ঘোড়া অবশ্যই আরো বেগে দৌড়াবে, এবং তাই দেখে অর্থমন্ত্রীরা উন্নয়ন আরো জোরে-সোরে হচ্ছে বলে সরকারের অর্থনীতি পরিচালনার আরো কৃতিত্ব দাবী করবেন!

উন্নয়নের মধ্যে এত সব ধরনের ঘটনা ধরতে হবে এসব কথা আমার একার নয় (যদিও যুক্তির মূল্য তার *ভারে* নয়, তার *ধারে*)। অর্থনীতিতে নোবেল-বিজয়ী অমর্ত্য সেনকে তো সরকার বাংলাদেশের পাসপোর্ট-ও দিয়েছে। এই বিশ্বনন্দিত অর্থনীতিবিদও স্পষ্টই রায় দিয়েছেন উন্নয়নের জিডিপি-কেন্দ্রিক মূল্যায়নের বিরুদ্ধে - তাঁর বিচারে "স্বাস্থ্য, অথবা শিক্ষা, অথবা সামাজিক সমতা, অথবা আত্মসম্মান, অথবা সামাজিক হয়রানি থেকে মুক্তি" - মানুষের এই সমস্ত 'স্বত্বাধিকার' প্রাপ্তির মুল্যায়নে "ইনকাম ইজ মাইল্স্ অফ্ দ্য টারগেট" (১৯৮৩ সালের ইকনমিক্ জার্নালে উন্নয়নের ওপর সেনএর বিখ্যাত প্রবন্ধ)। বিশ্বব্যাঙ্কের তৃতীয় শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্রা এখনো বহু মাইল দূরে বসে জিডিপি জিডিপি জপ্ করতে থাকতে পারেন, কিন্তু দেশে দেশে অর্থনীতিতে নেতিবাচক কর্মকান্ড যে হারে বাড়ছে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান নীচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা জিডিপির মধ্যে ধরা হচ্ছে না তাতে জিডিপি বৃদ্ধির হার দেশের উন্নয়নের অত্যন্ত মূর্খ একটি সূচক হিসাবে অনেক আগেই উন্নয়ন-শাস্ত্রে পরিগণিত হয়ে গেছে, এবং একবিংশ শতাব্দীতে এই মূর্খতাকে তার যথাযোগ্য স্থান দেখিয়ে আমাদের আরো অর্থপূর্ণ ও মানবিক উন্নয়ন-চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জিডিপি ও বাজেট এই প্রসঙ্গে আর দুটো টেক্নিকাল কথা বলে এই পর্যায় শেষ করব। প্রথম কথা, রাষ্ট্রের পরিচালকরা ও তাঁদের ঘনিষ্ট সহযোগীরা ছাড়া আর সবাই আজকে বোধ হয় একমত-যে সরকারী সংস্থাগুলো আজকে মূলতঃ জনগনের সেবা না করে তাদের ওপর বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন চালাচ্ছে। এইসব উৎপীড়নের কিছু উদাহরণ সরকারকে করদান প্রসঙ্গে আমি পরে দিচ্ছি। এখানে জিডিপির হিসাবের প্রশ্নে শুধু এইটুকুই বলব যে প্রত্যয়গতভাবে জিডিপির একাউন্টিংএ এরকম "সেবা"র কোন ইতিবাচক স্থান নেই - এদের জিডিপির হিসাবে শুধু নেতিবাচক স্থানই হতে পারে। অল্পসংখ্যক নিষ্ঠাবান সরকারী সেবক বাদ দিলে, ধরুন ৭০-৮০ পার্সেন্ট সরকারী কর্মচারীর নেতিবাচক "সেবা"র জন্য তাদের বেতন এদেশের জিডিপির মূল্যায়নে যোগের কলামে না ধরে বিয়োগের কলামে অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে এই অত্যন্ত সহজ যুক্তিটা সরকার ও তার কর্মচারীরা না মানতে চাইলেও

দেশের সার্বিক জনগনের মূল্যায়ন যে এটাই হবে একথা বোধ হয় প্রস্তাব করা যায়। আর এই উৎপীড়ন বেড়ে চল্‌ছে বলে যদি জনগনের রায় হয় তাহলে যথাযথ একউন্টিং হলে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির ওপর তার প্রভাবও নেতিবাচক হবে এটাই যথার্থ হিসাব। এই যথার্থ হিসাবটি না করে যান্ত্রিকভাবে জিডিপির প্রত্যয়টি না বুঝে সব সরকারী সেবার সরকার কতৃক ধার্য মূল্য (সরকারী কর্মচারীদের বেতন) জিডিপির হিসাবে যোগের কলামে ধরায় এই হিসাবে একটা বিরাট প্রতারণা ও বিকৃতি চলে আসছে যে কারণেও দেশের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না যেটুকু 'উন্নয়ন' জাতীয় আয় বৃদ্ধির হিসাব দেখিয়ে দাবী করা হচ্ছে সেটুকু উন্নয়ন হল কী করে!

দ্বিতীয় টেক্‌নিকাল কথাটি হল ক্যাপিটাল একাউন্টিং-এর প্রশ্ন। জিডিপি হল স্থূল (গ্রোস্‌) দেশজ আয়ের হিসাব, যে হিসাবের মধ্যে
(১) দেশের পার্থিব ও পরিবেশগত সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি (ডেপ্রিসিয়েশন অব ফিজিকাল অ্যান্ড এনভিরণমেন্টাল ক্যাপিটাল) ধরা হয় না;
(২) ক্রমবর্দ্ধমান বিদেশী ঋণের দায়ও ধরা হয় না।
এদেশের জাতীয় আয়ের হিসাবে এই দুটিকে বাদ দিয়ে জাতীয় আয়ের হিসাব করা অত্যন্ত দায়িত্বহীন। প্রথম প্রশ্নটি - অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন-এর প্রশ্ন - জাতীয় আয়ের হিসাব-তত্ত্বে বহু আগে (পঞ্চাশ-ষাট দশকে) আলোচিত হয়েছে বলে অনেকে -অর্থনীতির পন্ডিতরাও - হয়তো এই আলোচনা ভুলেই গিয়েছেন কিংবা তার কথা জানেনই না । জাতীয় আয়ের একাউন্টিং শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই প্রথম বিকাশ লাভ করে, যেখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে ক্যাপিটাল ডেপ্রিসিয়েশন (পরিবেশগত ক্যাপিটাল ছাড়া) পূরণ করবার প্রথা অনেকখানি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একাউন্টিং-এর সাধারণ নীতি অনুযায়ী স্থূল আয় থেকে ডেপ্রিসিয়েশন খাতে খরচ বাদ দিয়ে নীট আয়কেই জাতীয় আয় হিসাবে দেখাবার কথা; কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, বিশেষ করে দ্রুত প্রাযুক্তিক উন্নতি হচ্ছে বলে দেখা যায়-যে সামগ্রিকভাবে ক্যাপিটাল ডেপ্রিসিয়েশন পূরণ করা হয় পুরোনো ক্যাপিটালকে প্রযুক্তিগতভাবে আগের চাইতে উন্নততর মানের (নতুন "ভিন্‌টেজ"-এর) ক্যাপিটাল দিয়ে, এবং এই কারণে ডেপ্রিসিয়েশন বাবদ খরচ আসলে শুধু পুরোনো ক্যাপিটালের ক্ষয় পূরণই করে না, এই ক্ষয় পূরণ করতে যেয়ে ক্যাপিটালের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি হিসাবেই এই সমস্ত দেশের জাতীয় আয়ের একাউন্টিং-এ নীট জাতীয় আয়ের হিসাবে না যেয়ে স্থূল জাতীয় আয়ের হিসাবই ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যেহেতু ডেপ্রিসিয়েশন খাতে খরচের ফল কার্যত: নতুন "ক্যাপিটাল ফরমেশন" অর্থাৎ নীট বিনিয়োগের ফলের মতোই হয়।

বলাই বাহুল্য, আমাদের মতো শিল্পে অনুন্নত এবং ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের সংস্কৃতিতে অনভিজ্ঞ দেশে প্রবৃদ্ধির হিসাব করতে স্থূল জাতীয় আয় ব্যবহার করবার এই যুক্তি খাটে না।

আমাদের ক্যাপিটালের ক্ষয়ের সিংহভাগ এখনো রাস্তাঘাটের ক্ষয়, রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস, বন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘরবাড়ী-জমিজমার ক্ষয়, নদীনালা শুকিয়ে গিয়ে মাছ চাষের ও যানবাহনের ক্ষতি, নদীভাঙ্গায় জমিজমা ঘরবাড়ী অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রীর ক্ষতি, চিংড়ি চাষের জন্য পরিবেশ ও জমির উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষতি ও পানি দুষণ, ঢাকার 'লাইফ-লাইন' বুড়ীগঙ্গার বুকের ওপর সমাজবিরোধী লোভী মানুষের হত্যাযজ্ঞ, ইত্যাদি ধরনের হয়ে আসছে। এসমস্ত প্রক্রিয়ায় জাতীয় ক্যাপিটাল ক্ষয়ের অনেকখানি সময়মতো পূরণই হয় না, অনেকখানি কোনদিনই আর পূরণ হবার নয়, যেটুকু সময়মতো পূরণ হয় তাও প্রধানত: অধিকতর উৎপাদনশীল নতুন ভিন্‌টেজের ক্যাপিটাল দিয়ে হয় এই দাবী করা যায় না। এছাড়া পরিবেশগত বহুবিধ ক্ষয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে যথা বন সম্পদ, জৈব বৈচিত্র ধ্বংস, নদীতে শিল্পবর্জ্য জমে মাছের অকাল মৃত্যু, ভূগর্ভে পানির উচ্চতা হ্রাস, পানিতে আর্সেনিকের মাত্রক বৃদ্ধি ইত্যাদি, যেগুলি পূরণই হচ্ছে না (এই ধরনের প্রশ্ন আজকে শিল্পোন্নত দেশের জাতীয় আয় একাউন্টিংএর ক্ষেত্রেও উঠেছে যার জন্য এসব দেশের জাতীয় আয়ের হিসাবেও মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব আসছে।)। এই সমস্ত নানা কারণে এদেশে এই সব ধরণের ক্ষয়-ক্ষতি ক্যাপিটাল ডেপ্রিসিয়েশন একাউন্টে দেখিয়ে জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে তাদের বাদ দিয়ে প্রবৃদ্ধির হিসাব করা প্রয়োজন দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে: (১) টেঁকসই জাতীয় আয় তথা প্রবৃদ্ধির হিসাব করবার জন্য; ক্যাপিটাল খেয়ে ফেলে ফেলে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে থাকলে এই প্রবৃদ্ধির উৎসই নি:শেষ হতে থাকবে এবং এক সময় এই প্রবৃদ্ধি শুকিয়ে আসতে শুরু হতে বাধ্য। (২) উপরোক্ত বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়ক্ষতির দয়িত্বশীল হিসাবের সংস্কৃতি প্রচলন এবং এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য। এইভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব না করে বছরের পর বছর দেশের বাজেটে যেরকম যান্ত্রিকভাবে শিল্পোন্নত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত হিসাবের প্রত্যয় আমরা অনুসরণ করে চলেছি তা আমাদের নিজস্ব বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীন চিন্তা-ক্ষমতার খুব একটা গর্বের পরিচয় নয়, এবং আমাদের মামুলি জিডিপি বৃদ্ধির হার নিয়েই মহা কৃতিত্ব দাবী করে আমরা একই সঙ্গে কী হারাচ্ছি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মগুলির বেঁচে থাকবার জন্য আমরা কী রেখে যাচ্ছি তার হিসাব না করে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি, অর্থাৎ বিদেশী ঋণের দায়, প্রত্যয়গতভাবে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রশ্ন। এটি জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন এই অত্যন্ত সহজ কারণে যে এটি জাতির দেনা, এবং এটি বাদ দিয়ে জাতীয় আয়ের যা বাকী থাকে তার ওপরেই জাতির অধিকার জনগণের চাহিদা ও দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের সম্পদ বিনিয়োগের উৎস হিসাবে। এইভাবে হিসাব না করে বিদেশীদের কাছে দেনার দায় ও তার বৃদ্ধিকে উপেক্ষা করে জাতীয় আয়ের হিসাব করে জাতিকে প্রবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা দেওয়াও দায়িত্বশীল নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপরেও বৈদেশিক ঋণের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়ে তাদের উত্তরোত্তর

চাপের মধ্যে ফেলা হচ্ছে যে চাপ তাদের জাতি হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রনের সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত করে ফেল্‌ছে, এবং এসম্বন্ধে জাতীয় বাজেট পেশ করবার সময় যে সচেতনতার অভাব দেখা যায় তা অত্যন্ত দু:খজনক।

৩. সেবা না দিয়ে কর কেন?

("শুধু আমরা কর দিয়েই যাবো, রাষ্ট্র কি আমাদের কিছুই দেবে না?"
- দিল মনোয়ারা মনু, প্রথম আলো, ১৬ই জুন ১৯৯৯)

স্বাধীন চিন্তা করবার আরো কিছু প্রয়োজন আছে।
আগের পরিচ্ছেদে বলেছি-যে সেবার নামে আজকে সরকারী সংস্থাগুলি দ্বারা জনগনের ওপর নানা রকম উৎপীড়ন চল্‌ছে। একই সঙ্গে দেশে সুসংগঠিত সন্ত্রাসী-মস্তান-চাঁদাবাজদেরও ব্যাপক উৎপীড়ন চল্‌ছে (ঢাকায় সোবহানবাগ মার্কেটে-যে প্রতিটি দোকানকে দৈনিক দুইশ টাকা করে চাঁদাবাজদের দিতে হয় এটা সরকারকে দেয় ভ্যাটএর চেয়ে অনেকগুণ বেশি)। এটাই জনগনের কাছে আজকে বাস্তবতা। এই বাস্তবতার পরিপ্রক্ষিতে দেশে সরকারী খাতের প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে পুনর্ভাবনা এবং বাজেটে সরকারী সেবা ও কর-এর পুনর্সঙায়নের প্রয়োজন আছে।
প্রথমে সরকারী সেবার নামে যে উৎপীড়ন চল্‌ছে তার স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটা উদাহরণ দিই। যদিও এধরনের কোন না কোন অভিজ্ঞতা ক্ষমতাবান মন্ত্রী-সাংসদ-আমলা এবং সন্ত্রাসীরা ছাড়া দেশের প্রায় সকলেরই, কয়েকটা উদাহরণ প্রশ্নগুলির প্রত্যয়গত আলোচনা বুঝতে সাহায্য করবে।
১. আমার এক বিধবা বৃদ্ধা আত্মীয়ার কাছে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এই মর্মে নোটিশ আসে যে তিনি বছর কুড়ি আগে নাকি কয়েকমাস বিদ্যুতের বিল দেননি, যার জন্য তাঁকে এত বছরের চক্রবৃদ্ধি হারে সূদসহ প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো দিতে হবে, এবং অমুক দিনের মধ্যে এই বকেয়া শোধ না করলে বাসার বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ অফিস থেকে লোক এসে প্রস্তাব করে যে তাদের অল্প কয়েক হাজার টাকা দিলে রেকর্ড ঠিক করে দেয়া যেতে পারে। আমার বৃদ্ধা আত্মীয়া নিরূপায় হয়ে এই "সেবা বা সার্ভিস চার্জ"টা তাদের দিতে বাধ্য হন। আমি নিজে হলে হয়তো আমার এই পড়ন্ত বয়সেও গরমে ঘেমে হেঁটে বা রিক্সায় - যানযটের জন্য ওই পাড়ায় গাড়ী নিতে হয়রানি বেশি, যদিও হেঁটে বা রিক্সায় যেতেও জীবনটা হাতে নিয়েই যেতে হয় - বিদ্যুৎ অফিসে যেয়ে কিছুক্ষণ তর্ক করতাম বিশ বছর বকেয়া বিল আদায়ের নোটিশ না দিয়ে দায়িত্ব পালন না করবার জন্য তাঁদেরই চাকরী যাওয়া উচিত; কিন্তু তাতে কোন কাজ হত না এও জানি।
২. আমার এক পরিচিত ব্যক্তিকে তার একটি সম্পত্তি নিজেরই সন্তানদের নামে ট্রান্সফার করবার জন্য নির্দ্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি ও করের ওপরে রেজিস্ট্রেশন অফিসে ষাট-সত্তর

হাজার টাকার মতো, এক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের রীতিমতো সিনিয়র একজন অফিসারকে এক লাখ টাকা এবং নীচু লেভেলে আরো কয়েক হাজার টাকা "সেবা চার্জ" দিতে হয়েছে। না দিলে এক দফতরে ফাইল হারিয়ে যাবে বলে পরিষ্কার ঘোষণা হয়, আর এক দফতরে বারে বারে যেতে বলা চল্‌তেই থাকে যতক্ষণ না এপক্ষ থেকে নিজে জিজ্ঞেস করবার অসন্মান এড়াতে উকিলের সহকারী পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় "ভাই কত দিতে হবে"? অথচ ব্যাপারটা একেবারে রুটিন মাফিক রেজিষ্ট্রেশন ফি ও কর দিয়ে হয়ে যাবার কথা।
৩. এদেশে ড্রাইভেং লাইসেন্স গাড়ী চালানো না শিখেও এক হাজার টাকার মতো খরচ করলে পাওয়া যায় এই কথাটা আমিও জেনে গেছি। সম্প্রতি আমার গাড়ীর ফিট্‌নেস টেস্ট করাতে যেয়ে সংশ্লিষ্ট অফিস ভর্তি দালালদের কাছে জানলাম-যে গাড়ী না দেখিয়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট পেতে মাত্র ২২০ টাকা লাগে। কৌতুহলী হয়ে আমার সন্তানসম দালালকে পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করি, " তা বাবা ২০ টাকাটা কেন?" সে বলে-যে "স্যর এই বিশ ট্যাকাটাই তো আমি পামু, বাকিটা তো অফিসাররা লইবো"। ভয়াবহ হলেও এটা সত্য-যে সরকারী সেবার নামে এদেশে মানুষ মারবার লাইসেন্স দেয়া হয় - ব্যক্তিকে ১০০০ টাকা মূল্যে, আর গাড়ীকে ২২০ টাকা মূল্যে - "লাইসেন্স টু কিল"! প্রায়ই-যে আমরা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ট্রাফিক দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারের হৃদয়বিদারক আহাজারির ছবি দেখতে পাই সেই মৃত্যুর পেছনে কোন্ সরকারী সংস্থার "সেবা"র ছোঁওয়া রয়েছে সেই খোঁজ সংবাদপত্রগুলিও করছে না। (আমি নিজে গাড়ীর ফিট্‌নেস টেস্টের উপরোক্ত অভিজ্ঞতা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দৈনিক সংবাদপত্রে ছাপবার অনেক চেষ্টা করে আমার "বিশিষ্ট" পরিচয় সত্ত্বেও আমার অজানা কারণে ব্যর্থ হয়েছি!)

যেসব "ড্রাইভার" বা গাড়ীর মালিক এরকম সুযোগও নিতে চান না এবং বিধিসন্মত কাগজপত্র ছাড়াই রাস্তায় মটর-বাস-ট্রাক-বেবী চালান তাদের লক্ষ্য করে মাঝে-মাঝে "ট্রাফিক সপ্তাহ" ঘোষণা করা হয়। এই সপ্তাহটি ট্রাফিক পুলিশদের বিশেষ উপরি রোজগারের দিন এটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়ের 'সেবক'রা ছাড়া মোটামুটি আর সবারই জানা। এই সপ্তাহে ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় যানবাহন আটকিয়ে বিধিসন্মত কাগজপত্র না দেখাতে পারলে প্রতিটি কেস্ "মুক্ত বাজার" দর অনুযায়ী মাত্র একশ টাকা "সেবা-চার্জে" ক্লিয়ার করে দেয় কারণ অনেক কেস এক-এক দিনে ক্লিয়ার করতে হয়। "লাইসেন্স টু কিল"-এর প্রক্রিয়া এইভাবে তার 'মিশন' সমাপ্ত করে।

আর উদাহরণ দেব না কারণ দেবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। দেশের সব কয়টি দৈনিক সংবাদপত্র মিলে রোজই এরকম অসংখ্য উদাহরণ বেরোচ্ছে। দেশের পুলিশ-যে আজকে মূলতঃ সেবক না হয়ে উৎপীড়ক এসম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে দেশের কয়েকটি লিডিং সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় বেরিয়েছে। অন্যান্য সংস্থার "সেবক"দের উৎপীড়ন, দুর্নীতি, সরকারের কোটি-কোটি টাকা আত্মসাৎ, তাদের দ্বারা সরাসরি দেশের অন্যান্য সম্পদ (যথা,

জমি, বনসম্পদ) আত্মসাৎ অথবা এসব সম্পদের বেসরকারী লুণ্ঠনকারীদের সঙ্গে আঁতাত এধরনের সংবাদও প্রায় রোজই বার হচ্ছে।

সব মিলিয়ে যে সত্যটি আজকে দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট তা এই যে সরকারী কর্মচারীরা সবাই না হলেও তাঁদের সিংহভাগ তাঁদের ক্ষমতার জোরে দেশের জনগনের ওপর বিভিন্ন রকম নির্যাতন, অবৈধভাবে অর্থ আদায়, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ, মানুষ মারবার ব্যবস্থায় সহযোগীতা এবং জনগনের ওপর বেসরকারী নির্যাতনকারীদের সঙ্গে সহযোগীতায় লিপ্ত। এগুলো আজ সবার দৈনন্দিন জীবনের এতই সাধারণ ঘটনা-যে আমি একবার এরকম একটি ঘটনা আমার সামনে হতে দেখে আপত্তি করায় নির্যাতনকারীর দালাল অবাক্ হয়ে বলে উঠেছিলেন, "এটাই তো নিয়ম - আপনি কী বাংলাদেশের লোক নন?" সবাই যদি সত্যিই এগুলি মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে-যে এদেশে এগুলিই সামাজিকভাবে স্বীকৃত "নিয়ম", অতএব এতে "অন্যায়" কিছু নেই। আমার তবু শুধু সমাজ-বৈজ্ঞানিক হিসাবে সমস্যা থেকে যায় এই নির্যাতনগুলিকে জনগনের "সেবা" বল্‌তে, এবং বিশেষ করে জনগনকে এই "সেবা"র জন্য কর দিতে বল্‌তে! এরকম "সেবক"দের বেতন বাড়াবার প্রস্তাবও যে প্রায় প্রতি বছরের বাজেটে থাকে এবং এবারের বাজেটেও আছে এটাও অত্যন্ত আশ্চর্য। লাইসেন্স-টু- কিল-দানকারী সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি দেবার জন্য জনগণকে কর দিতে হবে এবং তাদের বেতন আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে জনগনের ওপর এর চাইতে বেশি নিষ্ঠুর, কদর্য, অমানবিক পরিহাস আমি চট্ করে চিন্তা করতে পারছি না।

একথা আজকে অত্যন্ত স্পষ্ট, যে সরকারী কর্মচারীদের সিংহভাগ জনগণের যাকে যে "সেবা" দিচ্ছেন তার জন্য "মুক্ত বাজার"-এর নিয়ম অনুযায়ী - যাকে অর্থশাস্ত্রে "সাপ্লাই-ডিমান্ডের ব্যালেন্স" বলা হয় - একটা "সার্ভিস বা সেবা-চার্জ" নিচ্ছেন। অর্থাৎ সরকারী সংস্থাগুলি কার্যত: প্রাইভেটাইজ্‌ড্ হয়ে গিয়েছে। এর জন্য তাহলে আবার কর কেন? আর ক্ষমতাসীন পার্টিরা কি কখনোই বুঝতে পারেন না যা কার্যত: হয়েই গিয়েছে অর্থাৎ সরকারী খাতের সিংহভাগের প্রাইভেটাইজেশন, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই স্বীকৃতি দিয়ে সরকারী বাজেটের অর্থ দিয়ে তাদের সাপোর্ট করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সেই অনুযায়ী জনগনের ওপর করভার কমিয়ে দিলে পার্টির জনপ্রিয়তা কতখানি বেড়ে যেতে পারে? এরকমটা সব সরকারী ডিপার্টমেন্ট বা এজেন্সীর ক্ষেত্রে সহজে করা যাবে না একথা সত্যি। কিন্তু "লাইসেন্স টু কিল্" দেবার দায়িত্ব (ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস্ সার্টিফিকেট), সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশনের দায়িত্ব, বিদ্যুৎ-টেলিফোন-গ্যাসের দায়িত্ব, এরকম অনেক "সেবা" এখনি প্রাইভেটাইজ করে দেওয়া যায় এতে আমি তেমন কোন সমস্যা দেখি না। এভাবে প্রথম পর্যায়ে যে-সমস্ত "সেবা" এখনি প্রহিভেটাইজ করে দেবার বিরুদ্ধে তেমন প্রবল যুক্তি নেই তাদের তা করে দিলে বাকী সরকারী খাতটা ছোট হয়ে আসবে যার ফলে তার সার্বিক সেবার মান উন্নত

করতে পারবার সম্ভাবনা বাড়বে যদি সরকার এ ব্যাপারে আন্তরীক হয়। তখন সরকারী সেবার জন্য জনগনের কাছে কর চাওয়া - যে কর বর্তমান করভারের চেয়ে অনেক কমও হবে - অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গতও মনে হবে। কিন্তু এধরনের একটা সংস্কার আন্তরীকভাবে না হলে "সেবা না দিলে কর কেন দেব?" - সমাজের কাছ থেকে সরকারের কাছে এই প্রশ্ন করবার সময় এসে গেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বাস্তবতাও মনে রাখা দরকার। আজকে এদেশে জনগন শুধু সরকারকেই কর দিচ্ছে না - মহল্লায় মহল্লায় মস্তান-চাঁদাবাজীদেরও "কর", "ফি" ইত্যাদি দিতে হচ্ছে বিভিন্ন "সেবা"রই জন্য। আমাদের দৈনিক জীবনের নিরাপত্তার জন্য এদের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে একথা আগেই আলোচনা করেছি। অনেক মহল্লায় দালান-কোঠা বানাতে মস্তানদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে "অনুমতি" ("পারমিট") নিতে হয়। দোকান বা ব্যবসা-বানিজ্য চালাতে, ডাক্তারির জন্য চেম্বার খুলতেও অনেক জায়গায় এরকম মহল্লার মস্তান-চাঁদাবাজদের কাছ থেকে একটা " পারমিট" নিতে হয় তার জন্য যথাযোগ্য "ফি" দিয়ে। অবৈধ ট্রাক-টার্মিনাল তৈরির জন্য পূরো মহল্লার সমস্ত যানবাহনের কাছ থেকে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা চাঁদা তোলার মতো প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে দেশে আজকে শুধু একটি সরকার নেই, একাধিক "সরকার" রয়েছে যাদের সকলের কাছেই বিভিন্ন ধরণের "সেবা" ও "উন্নয়ন"-কর্মকান্ডের জন্য "কর" বা "ফি" দিতে হয়। আরো উল্লেখযোগ্য-যে বিধিসম্মত সরকার যেখানে জনগনের কাছ থেকে নির্দ্ধারিত কর বা ফি নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ প্রতিশ্রুত সেবা আর দিচ্ছে না তার বদলে বিভিন্ন রকম উৎপীড়ন করছে যা আমি ওপরে আলোচনা করেছি, মহল্লার অবৈধ "সরকাররা" কিন্তু এরকম "কর" বা "ফি" নিয়ে সততার সঙ্গে প্রতিশ্রুত সেবা দিয়ে যাচ্ছে - অন্তত: আমি নিজে আজ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রমের কথা শুনিনি। নিরাপত্তার জন্য টাকা নিলে পাড়ার মস্তানরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা করে। অর্থাৎ পাড়ার মস্তানদের আচরণেও একটা ন্যূ্যনতম নিয়ম-নীতিবোধ আছে যা সরকারী কর্মচারীদের এবং তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের নেই। এই দু:খজনক তুলনার কথা বাদ দিয়ে, দেশের জনগনের কাছে বাস্তবতা যা তা হল এই যে তাদের জীবনসংগ্রামে আজকে শুধু বিধিসন্মত সরকারকেই নয়, আরো একাধিক "সরকার"কে বিভিন্নপ্রকার কর-ফি-চাঁদা-সেলামী ইত্যাদি দিয়ে যেতে হয়। একথাও আজকে সবারই জানা-যে দেশে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পেরেছে শুধুমাত্র বিধিসন্মত সরকারের দেশে আইন-শৃঙ্খলা রাখতে ব্যর্থতার জন্যই নয় - শুধু ব্যর্থতা হয়তো মার্জনীয় হতে পারে, কিন্তু সন্ত্রাস-মস্তানি-চাঁদাবাজির সঙ্গে সজ্ঞানে আঁতাত মার্জনীয় হতে পারে না যে আঁতাতের কথাও আজকে দেশের অগ্রণী সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয়তে বারে বারে উঠছে এবং যেকথা স্বয়ং দেশের রাষ্ট্রপতিও বারে বারে দেশবাসীকে বলে যাচ্ছেন।

এই বাস্তবতায় প্রতিবছর বাজেটে সরকাররা দেশের উন্নয়ন সম্বন্ধে যে অস্ত্রপ্রশস্তি প্রচার করেন তা দেশের জনগনের হতাশাগ্রস্থ তীব্র জীবনসংগ্রামের চেতনার সঙ্গে মেলে না যে সংগ্রাম বছরে বছরে তীব্রতর হচ্ছে। জনগনের চেতনার সঙ্গে সরকারের এই ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছিন্নতা অতীব দু:খজনক।

৪. উপসংহার

এধরনের লেখার বিশেষ সার্থকতা নেই যদি এর ওপর আলোচনা না হয়। আমি এই প্রবন্ধের পাঠকদের আমন্ত্রন করবো আমার বক্তব্যগুলির ওপর পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করতে এবং তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা পেশ করতে। আমরা খুব বেশী পরের চিন্তা লেন-দেন করি, পরের শেখান বুলি আওড়াই, আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদেশীদের কাছ থেকে নেওয়া পুরানো বস্তাপচা তত্ত্ব, উন্নয়নের সূচক ইত্যাদি ব্যবহার করে যাই তাদের ব্যবহার্যতা স্বাধীনভাবে প্রশ্ন না করে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতে আমাদের প্রশ্ন করতে শেখায় না, প্রশ্ন করতে আহ্বান করে না, প্রশ্ন করতে সাহস দেয় না। প্রশ্নটি শুধু শিক্ষকের কাছে নয়, সব প্রশ্ন সর্বোপরি নিজেদেরই কাছে, উত্তর নিজেরা খুঁজে নিজেদের অবস্থান বেছে নিয়ে তার ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিচয় দেবার জন্য। তাই আমি আশা করবো পাঠকরা প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, এবং তা করবেন উত্তর অপরের কাছ থেকে পাবার জন্য নয়, উত্তর অন্বেসন্ধানের জন্য। এই অন্বেসন্ধানে আমরা পরস্পরকে নিজের নিজের চিন্তা-বিশ্লেষণ বিবেচনার জন্য দিয়ে শাণিত করতে পারি, নিজের চিন্তা কারো ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে "ভোঁতা" করতে নয়।

একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে এই আহ্বান আমি বিশেষ করে দেশের তরুণদের কাছে করবো, কারণ আমরা প্রবীণরা ঔপনিবেশিক শাসনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে স্বাধীন চিন্তা করা প্রায় ভুলেই গেছি যেজন্য "জিডিপি", "কাঠামোগত সংস্কার", "মুক্ত বাজার", এসমস্ত বিদেশিদের শেখানো বুলি আউড়ে চলেছি আমাদের সমাজের জন্য এসমস্ত কথার তাৎপর্য না বুঝেই। এদেশের অর্থনীতিবিদরাও দেশের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের সুচক হিসাবে জিডিপির মৌলিক গলদগুলি সম্বন্ধে দু:খজনকভাবে উদাসীন, এমনকি অমর্ত্য সেনের নোবেল বিজয়ের পরেও। মুক্ত বাজার-যে সমাজের কল্যাণ আনবার বদলে বাজারের ওপর যারা ছলে-বলে-কৌশলে আধিপত্য করতে পারে তাদের হাতেই দেশের সম্পদ তুলে দেয় অর্থশাস্ত্রের এই প্রাথমিক পাঠটিও দেশের অনেক অথনীতিবিদই ভুলে গেছেন, রাজনীতিবিদদের কথা ছেড়েই দিলাম। আজকে ভীষণ প্রয়োজন দেশের তরুণদের তাদের মুরুব্বীদের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রভুত্ব ('হেজিমনি') থেকে নিজেদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে মুক্ত করে দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য এবং তাদের নিজেদেরই ভবিষ্যৎ বাঁচাবার জন্য প্রশ্ন করা, দিক্-নির্দেশনা সন্ধান করা, এবং ক্রমে সেই দিকে সমাজকে নিয়ে যাবার জন্য নেতৃত্বের ও সাংগঠনিক উদ্যোগের প্রস্তুতি নেওয়া। এর জন্য সময় কমে যাচ্ছে, দেশ দ্রুত

সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাচ্ছে, দেশের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেশের সম্পদ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় লুন্ঠন করা হচ্ছে, আর দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের আলোচনা দু:খজনকভাবে দেশের বাস্তবতা-বিবর্জিত হয়ে কয়েকটি পোষাকী সুচকের চারপাশে ঘুরপাক্ খাচ্ছে। আমি আশা করবো-যে দেশের তরুণরা এই অচলায়তনকে চ্যালেঞ্জ করে দেশের সমস্যাবলী স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে এগিয়ে আসবে, এবং একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী “জীবনের অর্থনীতি“ নির্মানের ভিত্তি রচনা করবে।

*প্রথম প্রকাশ: *দৈনিক অর্থনীতি, বিশেষ বাজেট সংখ্যা,* জুন ২০০০